Leaflets published from AICRP (G), BBG-Kolkata Unit.

Sl. No	Title	Year of Publications
1.	" Chhagal Palaner Kayekti Guruttapurna Dik" Editors: Prof P K Senapati, Dr Manoranjan Roy, Dr Uttam Sarkar and Dr Santanu Bera (Leaflet written in Bengali)	2014

ছাগল পালনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক

ছাগলকে গরীব মানুষের গাই (Poor man's Cow) বলা হয়। গৃহপালিত পশুদের মধ্যে ছাগলই প্রথম মানুষের বশ্যতা মানে। প্রাগৈতিহাসিক যুগেও ছাগল পালন হত তার অনেক প্রমান পাওয়া গেছে। মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পা যুগের শীলমোহর এবং হরপ্পা যুগের খেলনাতে ছাগলের ছবি দেখা যায়। বর্তমানে গ্রাম বা শহর অর্থনীতিতে ছাগল পালনের একটি বড় ভূমিকা রয়েছে। ছেট খামার করে ছাগ পালন করলে পরিবারের কাজের সাথেও বিকল্প আয়, বিকল্প পুষ্টির সংস্থান বাড়ীর মায়েরা বা বয়স্ক মানুষেরা করতে পারবেন। অনেক ক্ষেত্রে ছাগল হল মানুষের নিঃসঙ্গতা কাটানোর উপায়। ঘরোয়া ভাবে কম সংখ্যক ছাগল পোষার খরচ এবং ঝামেলা কম। ছাগল থেকে মাংস, চামড়া, দুধ, লোম এবং সার পাওয়া যায়। হাল্কা মালপত্র বহনের কাজে পাহাড়ী অঞ্চলে ছাগলকে ব্যবহার করা যায়। বর্তমান সময়ে ছাগলের মাংসের বিকল্প নিয়ে মানুষকে ভাবতে হয় না। ছাগলের দুধ খুবই উপকারী। পেটের রোগী ও শিশুদেরকে ছাগলের দুধ খাওয়ার কথা ডাক্তার বাবুরা বলেন। এজন্য ইউরোপে ছাগলকে শিশুর দুখী মা বলা হয়। কিছু কিছু প্রজাতির ছাগলের চামড়া অত্যন্ত দামী। যেমন আমাদের বাংলার কালো ছাগল। মানুষ তার জীবন যাপনের সাচ্ছন্দের জন্য বিভিন্নভাবে ছাগলকে ব্যবহার করে। যেমন খাদ্য হিসাবে। পোষাক পরিচ্ছদ তৈরীতে, সময় কাটানোর জন্য ছাগলকে গৃহপালিত করে নিয়েছে। উপযুক্ত পরিমাণ চারণ ভূমি থাকলে অনেক কম খরচে ছাগল পালন করা যাবে। বর্তমানে দেখা গেছে বিভিন্ন ধরণের কৃষি সংক্রান্ত উদ্যোগের মধ্যে ছাগল পালনেই সবথেকে লাভ বেশী। ছাগলকে বলা হয় 'গরিবের গাই'। গ্রাম বাংলার দরিদ্র ও খেত মজুর ও কৃষকের কাছে ছাগলপালন খুবই উপযোগী ব্যবসা। বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে ছাগল পালন করলে মানুষের আর্থিক সংস্থানের ক্ষেত্রে তা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। সামান্য কিছু নিয়মকানুন মানলেই গৃহপালিত পশুগুলির অনেকাংশে বহুরোগের হাত থেকে রক্ষা এবং কম খরচে পুষ্টিকর খাদ্যের যোগান দেওয়া সম্ভব, সমগ্র প্রাণীপালন ব্যবস্থার মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি যত্নবান হতে হবে।

● **পরজীবীঘটিত রোগ থেকে প্রাণীকে রক্ষা করুন ঃ**

পরজীবীঘটিত রোগ ঃ কৃমি জাতীয় বা পরজীবীঘটিত রোগের প্রাদুর্ভাব ছাগল পালনের মূল সমস্যা। ছাগল দু'ধরণের পরজীবী দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকে, (১) বাহ্যিক পরজীবী এবং (২) আভ্যন্তরীণ পরজীবী।

(১) বাহ্যিক পরজীবীরা হল - (ক) এঁটুলি, (খ) উকুন ও (গ) মাইট্‌স।

(ক) **এঁটুলি ঃ** এরা ছাগলের চামড়ায় পশমের মাঝে রক্ত খেয়েই বেঁচে থাকে। তাই আক্রান্ত ছাগলের রক্তাপ্লতা দেখা যায়। ছাগলের বৃদ্ধির হার কমে যায় এবং ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়ে। গরম ও আর্দ্র আবহাওয়া এঁটুলীর জীবনধারন ও বংশবৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত তাই এঁটুলীজনিত সমস্যা প্রধানতঃ গ্রীষ্মকালেই দেখা যায়। অন্যান্য ঋতুতে এই সমস্যা হয় না বললে চলে কিংবা হলেও তা নগণ্য।

(খ) **উকুন ঃ** এটি যদিও বিশেষ কোন শারীরিক সমস্যার কারণ নয়, তবুও কম বয়েসের ছাগলের ক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার হ্রাস পায় এবং দুর্বল হয়ে পড়ে। উকুনের প্রাদুর্ভাব কেবলমাত্র শীতকালেই দেখা যায়।

(গ) **মাইট্‌স ঃ** এই বহিঃপরজীবী প্রধানতঃ শরৎকাল ও শীতকালে সক্রিয়তা দেখায়। আক্রান্ত ছাগলে প্রথমে ক্ষত সৃষ্টি হয় পরে তার উপর মামড়ি পড়ে এবং এটা শরীরের যে কোন স্থানে দেখা যায়, তবে বিশেষতঃ কাঁধের চারপাশে দেখা যায়।

প্রতিকার ও প্রতিরোধ ঃ রোগাক্রান্ত ছাগলের গায়ে প্রাণী চিকিৎসকের পরামর্শমত সঠিক ওষুধ প্রয়োগ করলে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব। ছাগলকে সঠিক খাবার দিলে বাহ্যিক পরজীবীর আক্রমণ কম হয় বা হয় না বললেই চলে। আভ্যন্তরীণ পরজীবীর প্রাদুর্ভাব কম হলে বাহ্যিক পরজীবীও কম হয়। ছাগলকে নিয়মিত পরিষ্কারভাবে স্নান করালে এবং বাসস্থানে ওষুধ ছড়ালে বাহ্যিক পরজীবীর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

(২) আভ্যন্তরীণ পরজীবী ঃ ছাগলের আভ্যন্তরীণ পরজীবী বলতে বোঝায় প্রধানত ঃ (ক) কৃমি ও (খ) প্রোটোজোয়া।

(ক) **কৃমি ঃ** বিভিন্ন ধরনের কৃমির মধ্যে গোলকৃমি ও চ্যাপ্টাকৃমিই মারাত্মক ক্ষতি করে। ফিতেকৃমি ছাগলের ক্ষুদ্রান্তে ও পিত্তনালীতে পাওয়া গেলেও এর দ্বারা ক্ষতির পরিমান সামান্যই; তবে টিনিয়া মাল্টিসেপ্স নামক ফিতেকৃমির অপূর্ণাঙ্গ ধাপটি ছাগলের মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ডে গিয়ে প্রভূত ক্ষতি করে। ছাগলের গোলকৃমি জনিত রোগাক্রমণে রক্তাল্পতার সঙ্গে সঙ্গে পাতলা পায়খানা, ক্ষুদামান্দ্য দেখা দেয়। আক্রান্ত ছাগল আস্তে আস্তে শুকিয়ে যেতে থাকে। অত্যাধিক কৃমির প্রাধান্য হল মলের সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ কৃমি বেরিয়ে আসে। চ্যাপ্টাকৃমির মধ্যে অ্যাম্ফিস্টোম ও যকৃতকৃমিই প্রধান ক্ষতি করে। অ্যাম্ফিস্টোম তার অপূর্ণাঙ্গ অবস্থায় ক্ষুদ্রান্তে থাকাকালনী প্রধান ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যকৃত কৃমি তার পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় যকৃতের কার্যক্ষমতা নষ্ট করে দেয়। অ্যাম্ফিস্টোমের আক্রমণে দুর্গন্ধ যুক্ত পাতলা পায়খানা পিচকিরির মত বের হয়। পায়খানার সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছোট লাল রঙের মাংসপিণ্ডের ন্যায় অপূর্ণাঙ্গ কৃমি দেখতে পাওয়া যায়। বারবার পাতলা পায়খানা হওয়ার জন্য ছাগল দুর্বল হয়ে পড়ে এবং হঠাৎ মারা যায়। কখনো পাতলা পায়খানা আবার কখনো কোষ্ঠকাঠিন্যও দেখা দিতে পারে। হালকা জ্বরও থাকে। রক্ত শূন্যতার জন্য ক্রমে দুর্বল হয়ে মারা যায়। ফিতেকৃমির আক্রমণে অপূর্ণাঙ্গ কৃমি মস্তিষ্কর মধ্যে থাকে। এর ফলে দুই - তিন মাস পর থেকে জ্বর হতে শুরু করে। ছাগল মাঝে মাঝেই চক্রাকারে পাক খেতে থাকে। ছাগল মাথাটিকে দেওয়ালে ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ধীরে ধীরে চোখে কম দেখতে শুরু করে, দাঁত কড়মড় করে, লালা গড়াতে থাকে, খাবারের প্রতি অনীহা দেখা যায়। ছাগল সম্পূর্ণ রূপে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে।

(খ) **প্রোটোজোয়া জনিত রোগ ঃ** প্রোটোজোয়া জনিত রোগের মধ্যে ছাগলের প্রধানতঃ থাইলেরিওসিস, ব্যাবেসিওসিস্ ও ককসিডিওসিস্ রোগের আক্রমন বেশী। থাইলেরিওসিস্ রোগে বেশী বয়সের ছাগলের মৃত্যুর হার সবচেয়ে বেশী। এই রোগে জ্বর হয়, নাক দিয়ে জল গড়াতে থাকে, লাসিকা গ্রন্থি ফুলে যায়, রক্তাল্পতা দেখা দেয় ও ঘোলাটে রক্ত মূত্রের সাথে বেরিয়ে আসে। ব্যাবেসিওসিস্ ও থাইলেরিওসিস্ এই দুটি রোগ এঁটুলির মাধ্যমে এক ছাগলের দেহ থেকে অন্যের দেহে ছড়িয়ে পড়ে। ব্যাবেসিওসিস্ রোগে মারাত্মক জ্বর, রক্তাল্পতা ও কফি রঙের মূত্র দেখতে পাওয়া যায়।, এবং শেষে ছাগলটি মারা যায়। ককসিডিওসি্ প্রধানতঃ চার থেকে ছয় মাস বয়সের ছাগশিশুদেরই হয়। এতে বাদামী/হলুদাভ সবুজ রঙের মল, পেটে ব্যথা, রক্তাল্পতা, ক্ষুধামান্দ্য, শারীরিক দুর্বলতা দেখা দেয় এবং ছাগলের বৃদ্ধি হ্রাস হয়।

পরজীবীর ক্ষতিকারক দিক ঃ

১) প্রাণীদের গৃহীত খাবার খেয়ে অভাব সৃষ্টি করে।

২) শরীরের বৃদ্ধির হার কমে যায়, দুর্বল হয়ে পড়ে এবং রক্তাল্পতা সৃষ্টি করে।

৩) চামড়াতে ক্ষতের সৃষ্টি করে

৪) দুধ কমে যায়, বন্ধ্যাত্ব দেখা যায় এবং অনেক সময় বাচ্চা নষ্ট হয়ে যায়।

৫) ক্ষুদ্রান্ত, পিত্তনালী, রক্তের শিরা এবং পথ রুদ্ধ করে দেয় এবং কখনো ক্ষুদ্রান্ত ছিদ্র করে দেয়।

৬) দেহে লোমের উজ্জ্বলতা হারিয়ে যায়, দেহে খসখসে ভাব থাকে।

৭) শরীরে খাবারের পরিপাক ও পচনে বাধার সৃষ্টি এবং বৃহদন্ত্রের স্বাভাবিক নড়াচড়া বন্ধ করে।

৮) কিছু কিছু কৃমি এবং বহিঃপরজীবী প্রাণীদের শরীরে বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে।

৯) কখনো কখনো ভীতি ও বিরক্তির কারন হয় এবং চামড়া ও মাংসের মূল্য কমিয়ে দেয়।

পরজীবী আক্রমনের লক্ষন ঃ

১) পাতলা পায়খানা হয়।

২) চামড়া বা লোম খসখসে হয় ও টানলে উঠে আসে।

৩) প্রাণীর স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।

৪) পেট বড় হয়, দাঁত কিড়মিড় করে এবং খিচুনি হতে পারে।

৫) বেশীদিন আক্রান্ত হলে রক্তাল্পতা হয়, চোয়ালের নিচে জল জমে।

৬) অনেক সময় দুর্গন্ধ যুক্ত এবং রক্ত সহ পায়খানা পিচকিরির মত হয়।

৭) আদ্যপ্রাণী আক্রমনে জ্বর অনেকদিন ধরে থাকে, কফির মত মূত্র এবং লিম্ফগ্ল্যান্ড ফুলে যায়।

৮) পাখীতে দুর্বলতা, পক্ষাঘাত, উৎপাদন ও ওজন হ্রাস, বৃদ্ধি ব্যাহত, শ্বাসকষ্ট, ক্ষুধামান্দ্য ও ঝুঁটি ফ্যাকাসে বর্ণ ধারন করে।

পরজীবী আক্রমনের থেকে প্রতিকারের উপায় ঃ-

১। প্রাণী থাকার ঘর শুষ্ক, পরিষ্কার এবং যেন আলো বাতাস প্রবেশ করে।

২। আক্রান্ত প্রাণীকে আলাদা করে রাখতে হবে।

৩। গ্রীষ্মে ও শীতের সময় প্রাণীদের বাসস্থানে ঔষধ প্রয়োগ করলে বহিঃপরজীবীর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

৪। ছাগল ও ভেড়াকে একই চারণভূমিতে দীর্ঘদিন চরানো ঠিক নয়, ফলে গোলকৃমি দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

৫। উপযুক্ত ও নিয়মিত কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়াতে হবে। বাচ্চাকে ২১ দিন বয়সে প্রথমবার এবং তারপর প্রতি মাসে ১ বার করে ৩ মাস বয়স পর্যন্ত কৃমির ঔষধ খাওয়ানো উচিত।

৬। তিন মাস বয়সের পর থেকে প্রতিবার কৃমির ঔষধের সাথে লিভার এক্সট্রাক্ট ও ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স অবশ্যই খাওয়ান বা ইনজেকশনের মাধ্যমে দেন।

৭। তিন মাস বয়সের পর তিনমাস পর পর কৃমির ঔষধ খাওয়ান।

৮। ১৮ মাস বয়সের পর থেকে প্রয়োজনানুসারে বর্ষার আগে ও শীতের শেষে কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়ান।

পরজীবী ঔষধ ব্যবহারের নিয়ম ঃ-

১। সাধারনত সকালে খালিপেটে কৃমির ঔষধ খাওয়ানোই ভালো।

২। অনুবীক্ষণ যন্ত্রে মল পরীক্ষা করে কৃমির ডিম বা লার্ভা সনাক্ত করে প্রাণীচিকিৎসকের পরামর্শ মতো কৃমিনাশক ঔষধ ব্যবহার করলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

৩। তিন মাস বয়সের পর থেকে প্রতিবার কৃমির ঔষধের সাথে লিভার এক্সট্রাক্ট ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স অবশ্যই খাওয়ান বা ইনজেকশনের মাধ্যমে দেওয়া উচিত।

৪। গর্ভবস্থায় কৃমির ঔষধ খাওয়াতে হলে প্রাণীচিকিৎসকের পরামর্শ প্রয়োজন।

৫। সাধারণত বর্ষার আগে ও শীতের শেষে নিয়ম করে কৃমির ঔষধ খাওয়াতে হবে।

● সবুজ প্রাণী খাদ্য চাষ কেন করবেন ঃ

খাদ্য, প্রজনন, প্রতিপালন, চিকিৎসা ও রোগ প্রতিরোধ হল উন্নত প্রথায় প্রাণীপালনের মূল বিষয়। প্রাণী পালনের শতকরা ৭০ শতাংশ ব্যয় হয় খাদ্যের পিছনে। তাই প্রাণী পালনকে লাভজনক করে তুলতে হলে সবুজ খাদ্যের চাষ করতে হবে। বিবিধ কারণে সবুজ প্রাণী খাদ্য চাষ করা দরকার।

১। অল্পখরচে পুষ্টির যোগান দেওয়া সম্ভব হবে।

২। খাদ্য এবং বাচ্চা দেওয়ার ক্ষমতা ঠিক থাকবে।

৩। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়বে।

৪। কম খরচে বেশী লাভ হবে।

তাছাড়া সবুজ খাদ্য চাষের ফলে -

১। মাটির গঠন ঠিক রাখা সম্ভব।

২। মাটির জল ধারণ ক্ষমতা বাড়ানো যায়।

৩। ভূমিক্ষয় রোধ করা যায়।

৪। অনুর্বর ও পতিত জমিতে চাষযোগ্য করে তোলা যায়।

৫। আগাছা ও কীট শত্রুকে দমন করা যায়।

৬। শুঁটি জাতীয় সবুজ প্রাণী-খাদ্য চাষের মাধ্যমে জমির উর্বরা শক্তি বাড়ানো যায়।

৭। একফসলী জমিকে বহুফসলী জমিতে পরিনত করা যায়।

প্রধান প্রধান সবুজ ঘাসের চাষের সময়-

খারিফখন্দ	রবি খন্দ	বারো মেসে ঘাস
জোয়ার বা গামা	বারসীম	সংকর নেপিয়ার
ভুট্টা	লুসার্ন	প্যারা
বরবটি		মটরশুটি গিনি
গাইমুগ	ওট	সুবাবুল
দীননাথ		

● **টীকাকরনের মাধ্যমে মারাত্মক কোন ব্যাধি থেকে প্রাণীকে রক্ষা করুন ঃ**

কোন কোন ভাইরাস এবং ব্যাক্টিরিয়া প্রাণীদেহে মারাত্মক কিছু রোগের সৃষ্টি করে। যা থেকে প্রাণীকে সহজে বাঁচানো গেলেও প্রাণীপালক আর্থিক লোকসানের সম্মুখীন হন। বছরের বিভিন্ন সময় নিয়মকরে টীকাকরন করলে জীবানু ঘটিত অনেক রোগব্যাধির থেকে প্রাণীকে রক্ষা করা যায়।

ভেড়া ও ছাগল -

রোগের নাম	টীকা দেবার সময়	প্রথমবার দেবার সময়	পুনরায় প্রয়োগের নিয়ম
এন্টোরটক্সিমিয়া	গ্রীষ্ম এবং শীতের পূর্বে	৩ মাস	৬ মাস অন্তর
বসন্ত	গ্রীষ্মে	৩ মাস	১ বছর অন্তর
সি.সি.পি.পি.	শীতের পূর্বে	৩ মাস	১ বছর অন্তর
পি.পি.আর	শীতের পূর্বে	৩ মাস	৬ মাস অন্তর

ছাগলের রোগ প্রতিরোধক সাধারণ শর্তাবলী ঃ

কথায় বলে 'রোগ প্রতিরোধই নিরাময়ের একমাত্র উপায়'। কয়েকটি সাধারণ বিষয়ের দিকে নজর রাখলে ছাগলের রোগ - ভোগ কম হবে যা প্রাণী - পালকের আর্থিক লাভের অংক বাড়াতে সহায়তা করবে। -

১। মুক্ত অবস্থায় ছাগল পালন করলে লক্ষ্য রাখতে হবে চরবার জায়গা যেন পরিচ্ছন্ন ও দূষণ মুক্ত হয়।

২। বদ্ধ অবস্থায় ছাগল পালনের ক্ষেত্রে বসবাসের জায়গা নিয়মিত পরিষ্কার করা প্রয়োজন।

৩। অসুস্থতার কোন রকম লক্ষণ দেখলেই প্রাণিচিকিৎসকের পরামর্শ মত যত শীঘ্র সম্ভব চিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিত।

৪। অসুস্থ ছাগলটিকে অন্যান্য সুস্থ ছাগলের থেকে দূরে রাখতে হবে।

৫। ছাগল যেন দূষিত বা পচা খাবার যেমন রান্নাঘরের উচ্ছিষ্ট, নোংরা ঘাস - পাতা, নর্দমার জল না খায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার।

৬। হঠাৎ করে ছাগলকে চরবার জায়গা পরিবর্তন করা উচিত না।

৭। যতটা সম্ভব খোলা - মেলা অথচ রোদ - বৃষ্টি থেকে আশ্রয় পাবে এমন জায়গায় ছাগলকে রাখা উচিত।

৮। ছাগলকে শীতকালে ১৫ দিন অন্তর এবং বছরের অন্য সময়ে ৩ দিন অন্তর একবার স্নান করানো ভালো।

৯। এলাকা বিশেষে ছাগলের প্রধান সংক্রামক রোগগুলির প্রতিষেধক টীকা দেওয়া অবশ্য কর্তব্য।

১০। নিয়মমাফিক বহিঃপরজীবীর চিকিৎসা করলে এবং কৃমির ওষুধ খাওয়ালে (বিশেষত বর্ষার আগে ও পরে) ছাগল পালন নিশ্চিতভাবে লাভজনক ব্যবসায় পরিগণিত হবে।

ভারত সরকারের কৃষিমন্ত্রকে আর্থিক সহায়তায় পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্যবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত। লেখায় ঃ ডঃ পি. কে. সেনাপতি, ডঃ মনোরঞ্জন রায়, ডঃ উত্তম সরকার ও ডঃ শান্তনু বেরা। সর্বভারতীয় সুসংহত ছাগ মানন্নোয়ন গবেষণা প্রকল্প।